Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইয়্যেদা ফাতেমা

রোলঃ 23090121207

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাইয়্যেদা ফাতেমা

রোলঃ 23090121207

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাইয়্যেদা ফাতেমা, আইডিঃ 23090121207 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাইয়্যেদা ফাতেমা

(স্বাক্ষর)

সাইয়্যেদা ফাতেমা

আইডিঃ 23090121207

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

তাসাউফের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি 6

তাসাউফের সংজ্ঞা 6

তাসাউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 6

তাসাউফের ঐতিহাসিক বিকাশ 7

প্রাথমিক যুগ (নবী যুগ থেকে তাবেঈগণ যুগ) 7

মধ্যযুগ 7

সুফি তরিকা 7

তাসাউফের প্রধান ধাপ 8

বিখ্যাত সুফি ব্যক্তিত্ব 9

তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি 10

তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির ধারনা 10

কুরআন ও হাদিসে আত্মশুদ্ধির ভিত্তি 10

কোরআনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 10

হাদিসে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব 11

সুফিদের মতে আত্মশুদ্ধি 12

দার্শনিকদের মতে আত্মশুদ্ধি 14

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা 14

নাফস বা আত্মার বিশ্লেষণ 16

নাফসের সংজ্ঞা 16

নাফসের বিভিন্ন স্তর 16

নাফস বা আত্মার রোগের লক্ষন সমূহ 18

আত্মশুদ্ধির উপায় 19

আত্মশুদ্ধির প্রধান পদক্ষেপসমূহ 24
আত্মিক রোগগুলো থেকে বাঁচার উপায়.....33
আত্মশুদ্ধির ব্যবহারিক পদ্ধতি.....39
তাসাউফের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি 45
তাসাউফ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ 46
তাসাউফও অন্য ধর্মের প্রতি সম্প্রীতি.....47
আধুনিক সমাজে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা 47
আত্মশুদ্ধির পথে বাধা ও এর সমাধান.....48
তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির ইতিবাচক ফলাফল 48

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

তাসাউফ ইসলামিক আধ্যাত্মিকতার এমন একটি উপায়,যা ক্বলব,ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধ উন্নীত করনের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ নির্দেশ করে। ইসলামের বাহ্যিক আমল (শরিয়াহ) ও অভ্যন্তরীন আমল (আধ্যাত্মিকতা) – এ দুইয়ের সমন্বয়ই প্রকৃতপক্ষে তাসাউফের উদ্দেশ্য। আত্মশুদ্ধি হল আত্মার পবিত্রতা অর্জনের এমন একটি প্রক্রিয়া যেটি তাসাউফ মূল উদ্দেশ্য গুলোর মধ্যে অন্যতম।

তাসাউফের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

তাসাউফের সংজ্ঞা

তাসাউফ (تَصَوُّف) শব্দটির আভিধানিক অর্থ আধ্যাত্মিকতা,সুফিবাদ।
তাসাউফ শব্দটি এসেছে মূল আরবী শব্দ 'সুফ' (صوف) থেকে,যার অর্থ উল।প্রথম যুগের সুফিগণ ছিলেন একেবারে সাদামাটা এবং তাদের পোশাক ছিলো উলের মতন মোটা যা তাদের বিনয়ের পাশাপাশি দুনিয়ার মোহ ত্যাগের প্রতীক স্বরুপ ছিল।
কোনো কোনো মতে বলা হয়,তাসাউফ শব্দটি 'সাফা'(صفا) শব্দ থেকে এসেছে,যার প্রকৃত অর্থ 'বিশুদ্ধতা'।এই মতের প্রেক্ষিতে,তাসাউফ কে অন্তরের বিশুদ্ধতা অর্জনের একটি কার্যকরী পথ হিসেবে ও সংজ্ঞায়িত করা যায়।

ইমাম আল-জুনাইদ বলেন:
"তাসাউফ হলো আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় থাকা, যেখানে তাঁর ছাড়া অন্য কারও ওপর নির্ভরতা থাকে না।"*১

তাসাউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

তাসাউফ ইসলামী আধ্যাত্মিকতার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শাখা।
যার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো,
আত্ম শুদ্ধিকরণ,অভ্যন্তরীণ দোষ সমূহ (হিংসা,অহংকার ও লোভ) থেকে ক্বলবকে পবিত্র রাখা এবং একই সাথে সৎ গুন গুলো দ্বারা তাকে সজ্জিত করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার পথে এগিয়ে যাওয়া।

তাসাউফের ঐতিহাসিক বিকাশ

প্রাথমিক যুগ (নবী যুগ থেকে তাবেঈগণ যুগ)

ইসলামের প্রথম যুগেই তাসাউফের আবির্ভাব হয়েছিল বলে,জানা যায়।তখনকার সময়ে তাসাউফ আলাদা কোনো দল হিসেবে উল্লেখিত ছিল না।
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবারা এবং তাদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অনেক মানুষ ছিলেন যারা দুনিয়ার সকল বিষয় থেকে দূরে থাকতেন আর আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।তারা সব সময় সরল সাদা জীবনযাপন করতেন।এই যুগের প্রধান বিশেষত্ব ছিল প্রচেষ্টা,দুনিয়া বিমুখতা ও আল্লাহভীতি ।

মধ্যযুগ

ইমাম গাজ্জালী, ইমাম কাশানী,ইবনে আরাবি প্রমুখ চিন্তাবিদগণ তাসাউফকে এক শক্তিশালী জ্ঞানীয় রূপ দেন।এগুলো অন্তর্ভুক্ত হয়;সজ্ঞান,প্রজ্ঞা,বুদ্ধিমত্তা,আত্মিক উন্নয়ন।

সুফি তরিকা

তাসাউফ বিভিন্ন তরিকা বা পদ্ধতির মাধ্যমে চর্চা করা হয়, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:
চিশতিয়া,সোহরাওয়ার্দি, কাদিরিয়া,নকশাবন্দিয়া
এইগুলোর মূল লক্ষ্য এক হলে ও অনুসরণ করার পদ্ধতি সেই সাথে অনুশীলনেও কিছু ভিন্নতা থাকে।

তাসাউফের প্রধান ধাপ

তাসাউফের ধাপ সাধারনত চারটি,যথা:

১.শরীয়ত: ইসলামের অন্তর্নিহিত বিধান (নামাজ,রোজা,যাকাত ইত্যাদি) অনুবর্তন করার মাধ্যমে শুরু হয়।

২.তরিকত: এই পর্যায়ে আত্মিক প্রচেষ্টা ও আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির রূপান্তর শুরু হয়।

৩.মারিফাত: আল্লাহর জ্ঞান ও উপস্থিতির নিবিড় অনুভব।

৪.হাকিকত: এটি তাসাউফের শেষ পর্যায়,এই পর্যায়ে সত্য বোধ হয় এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার ঐক্য অনুভব হয়।

বিখ্যাত সুফি ব্যক্তিত্ব

*আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)

*খাজা মইনুদ্দিন চিশতী (রহ.)

*জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.)

*হাসান আল-বাসরি (রহ.)

উল্লেখিত ব্যক্তিগণ কেউ ভালোবাসার দিক থেকে কেউ বা ইখলাসের দিক থেকে তাসাউফের
ব্যাখ্যা করেছেন।
তাসাউফ শুধু মাত্র নিজস্ব আত্মশুদ্ধির জন্য নয়,পক্ষান্তরে এটি সমাজে
ন্যায়পরায়ণতা,সমবেদনাসম্পন্ন ও মানব সমাজের প্রতি ভালোবাসা ছড়াতে ও সক্ষম।কারণ
এর ভিত্তি হিসেবে রয়েছে পবিত্রতা,শিষ্টাচার ও যিকির।

শরীয়তের হুকুম-আহকাম পালনের পাশাপাশি ক্বলবের পবিত্রতাকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে
উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য রেখে মানুষকে একটি সফল ও স্থিতিশীল জীবনের পথে পরিচালিত
করাকে তাসাউফ বলে।

তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধি

তাযকিয়াতুন নাফস বা আত্মশুদ্ধির ধারনা

তাযকিয়া (تزكية) শব্দটি ইসলামী পরিভাষায় আত্মাকে অহংকার অপবিত্র ও অনৈতিক কার্যকলাপ থেকে দূরে রাখার একটি পন্থা।

তাযকিয়া শব্দটি আরবি 'زكى' জাকা থেকে এসেছে।এর অর্থ পরিশুদ্ধ করা,উন্নত করা।

ইসলামে 'তাযকিয়াতুন নাফস' হলো আত্মিক পরিশুদ্ধি।

কুরআন ও হাদিসে আত্মশুদ্ধির ভিত্তি

কোরআনে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

কোরআনে আত্মশুদ্ধিকে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বারবার আয়াত নাযিল হয়েছে,

আল্লাহ তায়ালা আত্মশুদ্ধি নিয়ে বলেন:

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا ۪

অর্থ - "যে ব্যক্তি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সেই সফলকাম হয়েছে।"

(সূরা আশ-শামস: ৯)

উল্লেখ্য যে,আল্লাহ তাআলা সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর নামে শপথ করে আয়াতটি বলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সাতটি বস্তুর নামে শপথ করেছেন তা হলো -

শপথ সূর্য ও তার কিরণের,শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়,শপথ দিবস এর যখন সে তাতে প্রকাশ করে,শপথ রাতের যখন সে তাতে আচ্ছাদিত করে,শপথ আকাশের যিনি তা নির্মাণ করেছেন তার,শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাতে বিস্তৃত করেছেন তার, শপথ মানুষের এবং যিনি তাতে সুঠাম করেছেন, শপথ তাদের

তার অসৎকর্ম এবং সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।এখানে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হলো: সূর্য,চন্দ্র,দিন,রাত,আকাশ,পৃথিবী ও মানুষ।

এই একই সুরার ঠিক পরের আয়াতে আল্লহ বলেছেন:

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا

অর্থ - "এবং সে ব্যর্থ হয়েছে, যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে।"

(সূরা আশ-শামস: ১০)

উপরে উল্লেখিত আয়াত দুটি থেকে আমরা বুঝতে পারি যে,আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আত্মশুদ্ধির বিষয়ে কতখানি জোর দিয়েছেন।আত্মশুদ্ধি আমাদের ইসলামী জীবনধারায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ।তাই আমাদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে এর চর্চা সর্বদা জারি রাখতে হবে।কেননা এর চর্চা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব আর মনে রাখতে হবে যে,মানুষের প্রকৃত সফলতা তার ক্বলবের পবিত্রতায়,বাহ্যিক ধন-দৌলত বা সম্মানে নয়।

হাদিসে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব

নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,
আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি,রাবী বলেন;
এ সময় নু'মান তার আঙ্গুল দুটি দ্বারা কানের দিকে ইশারা করেন,নিশ্চয়ই হালাল স্পষ্ট এবং হারাম ও স্পষ্ট,আর এ উভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহজনক বিষয়,অনেক লোকই সেগুলো জানে না।যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে সে তার দ্বীন ও মর্যাদাকে নিরাপদে রাখে,আর যে লোক সন্দেহজনক বিষয়ে পতিত হবে সে হারামের মধ্যে লিপ্ত হয়ে পড়বে।যেমন কোন রাখাল সংরক্ষিত চারণভূমির পাশে পশু চরায়, আশংকা রয়েছে সে পশু তার ভেতরে গিয়ে ঘাস খাবে। সাবধান!প্রত্যেক রাজারই সংরক্ষিত এলাকা থাকে,সাবধান আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হলো তার হারামকৃত বিষয়গুলো।

জেনে,রেখো,দেহের মধ্যে এক টুকরা মাংস আছে।যখন তা সুস্থ থাকে তখন সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে।আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন সমস্ত দেহই নষ্ট হয়ে যায়।স্মরণ রেখো, তা হলো ক্বলব (হৃদয়)।*২

এই মাংসপিণ্ড (হৃদয়) পুরোপুরি শুদ্ধ না হলে আচরণ ও শুদ্ধ হবে না।

সুফিদের মতে আত্মশুদ্ধি

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তার বিখ্যাত কিতাব **"এহইয়াউ উলমিদ্দীন"** এ- আত্মশুদ্ধি নিয়ে বলেছেন,

> **"হৃদয়ের রোগ হলো রাগ,লোভ,গর্ব,হিংসা।আর আত্মশুদ্ধি হলো এগুলোর চিকিৎসা।"**

তিনি কুরআন অনুসারে আত্মার ধারনা ৪টি আরবি শব্দের মাধ্যমে ব্যাখা করেছেন।

সেগুলো হলো -

১.ক্বলব (قلب)

২.রুহ (رُوح)

৩.নাফস (نَفْس)

৪.আকল (عَقْل)

ইমাম গাজ্জালী বিশ্বাস করতেন যে,কেবল দেহের রোগেকেই গুরুত্ব দিলে হবে না,হৃদয়ের

রোগকে ও সমান ভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তিনি তার 'এহহিয়্যাহ উলুমউদ্দীন' গ্রন্থে ছয় ধাপে আত্মশুদ্ধির পথ বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হলো -

- **মুশারাতাহ :** লক্ষ্য সময়ের সঙ্গে আত্মার চুক্তি করা।
- **মুরাকাবাহ :** নিজের আচরণ ও মনোভাব পর্যবেক্ষণ করা।
- **মুহাসাবাহ :** আত্মপর্যালোচনা ও নিজের প্রতি দায়বদ্ধ থাকা।
- **মুজাহাদাহ :** আত্ম-চুক্তি ভাঙার ক্ষেত্রে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা (ত্রুটি ও পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে)।
- **মু'আকাবাহ :** পাপাচরণের প্রবৃত্তি দূর করার জন্য পরিশ্রমী প্রচেষ্টা চালানো।
- **মু'আতাবাহ :** চুক্তি ভাঙ্গার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পুনরায় প্রতিজ্ঞা করা।

ইমাম রাব্বানী (রহঃ)

তিনটি সূরা যথাক্রমে,সূরা ইউসুফের আয়াত ৫২,সূরা ফাজরের আয়াত ২৭ ও সূরা আল-ক্বিয়ামাহ এর আয়াত ২ - গুলোতে নাফসের বিভিন্ন স্তর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।তিনি বিভিন্ন ইসলামিক উৎস থেকে নাফসের যে বণর্না পেয়েছেন,সেগুলোর ভিত্তিতে তিনি বলেছেন,

" আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্য হলো, নাফসকে আম্মারা থেকে মুতমাইন্নায় উন্নীত করা।"

দার্শনিকদের মতে আত্মশুদ্ধি

ইসলামিক দার্শনিকদের মতে,

নফস হলো মানুষের অভ্যন্তরীণ চাহিদার কেন্দ্র,
রুহ হলো মানুষের আধ্যাত্মিক সত্তা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে
ক্বলব হলো মানুষের অনুভূতি ও চিন্তার কেন্দ্রস্থল।

আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা

প্রতিনিয়ত নফস এর ইসলাহ করা বা উন্নয়ন
ঘটানো প্রয়োজন।প্রতিদিন আত্মশুদ্ধি
প্রয়োজন,প্রতি সপ্তাহে প্রয়োজন।মোটকথা আমরা যতদিন জীবন পাই এর প্রতিটামুহূর্তেই আমাদের নফসকে তাযকিয়া করা প্রয়োজন বা এর পরিশুদ্ধি ঘটানো প্রয়োজন।নফসকে সাধারনত একটি জমির সাথে তুলনা করা যায়,কারন একটি জমি অনেকদিনের অযত্নে পড়ে থাকার ফলে এতে আগাছায় ভরে যায় যার জন্য জমিটি তার উর্বরতা হারায়।ঠিক একইভাবে যখন আমাদের নফসের মধ্যে এমন সব কাজ (যা ইসলাম বিদ্বেষী বা অশ্লীল কাজ,যে সমস্ত কাজ আল্লাহ অপছন্দ করেন) দিয়ে ভরপুর থাকার কারনে নফসে ও তখন এক ধরনের আগাছা জন্মায়,যার ফলে জমির মতো নফস ও তার উর্বরতা হারায়।যদি জমি থেকে আমরা উৎকৃষ্ট মানের ফসল পেতে চাই,তাহলে আমাদের এর যত্ন নিতে হবে,আগাছা পরিষ্কার করতে হবে,উত্তমভাবে হাল চাষ করতে হবে,পরিমাণ মতো পানি দিতে হবে, কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে।তবেই আমরা সেখান থেকে ভালো ফসল আশা করতে পারব।আমাদের নফস ও ঠিক তেমন।যখন আমরা দেখব আমাদের নফস এর উর্বরতা হারিয়ে ফেলেছে,লাগামহীন হয়ে যাচ্ছে,তখন আমাদের ইসলাহ করতে হবে বা সংস্কার করতে হবে। এর প্রয়োজনীয় খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে। নফসের খাবার হচ্ছে
জিকির আজগর করা,কোরআন তেলাওয়াত করা,সময় মত নামাজ পড়া,নফল ইবাদত করা ইত্যাদি।আমরা যখনই নফসকে আগাছা মুক্ত রাখতে পারবো,তখন এর আত্ম উন্নয়ন ঘটবে।আর আমরা যদি নফস থেকে আগাছা গুলো দূর করতে না পারি তাহলে এটা

আমাদেরকে সামনের দিকে আগাতে দিবে না,আমাদের আত্ম উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে

দাঁড়াবে।জমির আগাছা নিয়ে আমরা যে আলোচনা করলাম,এটা কিন্তু পরিষ্কার করা খুব সহজ কিন্তু নফসের আগাছা (অশ্লীল চিন্তাভাবনা করা খারাপ মনোভাব রাখা,হিংসা করা কিংবা গীবত যাবতীয় কর্মকাণ্ড করা) এগুলো খুব সহজে দূর করা যায় না।এগুলো দূর করার জন্য কঠিন আত্মশক্তির প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহান ও তায়ালার কাছে প্রচুর দোয়া করার প্রয়োজন।এবং এটি অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয়।

নাফস বা আত্মার বিশ্লেষণ

নাফসের সংজ্ঞা

নাফস (نَفْس) একটি আরবি শব্দ।দেহ ও আত্মার মিলিত অস্তিত্বের নাম নফস। ইসলামি পরিভাষায় নফস এমন একটি শক্তি,যা মানুষকে ভালো-খারাপের পথে পরিচালিত করে। এটি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা এমন একটি সত্তা,যা মানব আচরণ প্রস্তুত এর মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

নাফসের বিভিন্ন স্তর

১. নাফসে আম্মারা : এটি নাফসের সর্বনিম্ন,অশান্ত স্তর।এই নসফস মানুষকে মন্দ কাজের দিকে চালিত করে।যেমন:রাগ,হিংসা,অশ্লীল চিন্তা সহ যাবতীয় খারাপ কাজের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়। ফেরাউন নমরুদ সহ সকল কাফিররা এই নফসের অন্তর্ভুক্ত ছিল,যার ফলে এরা সবাই জাহান্নামী।

কুরআনে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

অর্থ - "নিশ্চয়ই নাফস মানুষকে মন্দ কাজেই প্ররোচিত করে" (সূরা ইউসুফ: ৫৩)

২.নাফসে লাউয়ামা : এখানে মানুষ ভুল করলে নিজেই নিজেকে দোষারোপ করে। কখনো ভালো কাজ করে, কখনো মাঝপথে পিছিয়ে যায়।মাঝে মাঝে তওবা করার ইচ্ছা জাগে। এই স্তরে ঈমান দুর্বল হলেও জীবিত থাকে।তাই এই নাফসকে মধ্যবর্তী স্তর বলা হয়। এই স্তরে কখনো রুহের জয় হয়

কখনো বা শরীরের।নেককার,মুমিন বান্দাগণ এই নাফসের

অধিকারি।

কুরআনুল কারীমে নাফসে লাউয়ামা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

অর্থ - "আমি শপথ করছি নিন্দাকারী নাফসের" (সূরা কিয়ামাহ: ২)

৩. নাফসে মুতমাইন্নাহ : এই নফসকে প্রশান্ত নাফস বলা হয়। একে নফসের সর্বোচ্চ স্তর

হিসেবে ধরা হয়। এই নফস গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে সেই সাথে

আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তে খুশি থাকার

পাশাপাশি আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য সর্বদা নিজেকে

প্রস্তুত রাখে।

কুরআনে এ সুউচ্চ নফস সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ارْجِعِىٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

অর্থ - "হে প্রশান্ত নাফস! তোমার প্রভুর দিকে ফিরে এসো, সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্টকারী হয়ে"

(সূরা ফজর: ২৭-২৮)

নাফস বা আত্মার রোগের লক্ষন সমূহ

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন,শারীরিক ও আধ্যাত্মিক রোগের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন,

“দেহের রোগ যেমন দৃষ্টিশক্তি ও শোনার ক্ষমতা কে নষ্ট করে দেয়, তেমনি আত্মার অসুস্থতায়, হৃদয় ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে।”৩

মানুষের নাফস যখন অসুস্থ হয়,তখন যে লক্ষনগুলো দেখা যায় তা হলো,

*পরনিন্দা করা
* মিথ্যা বলা
*অহংকার করা
*হিংসা-বিদ্বেষ করা
* অতিমাত্রায় লোভ করা

ইবনে তাইমিয়্যাহ মাজমূল ফতোয়া এবং শারহুল আক্বীদাহ আল-ওয়াসত্বীয়া,এবং অন্য অনেক গ্রন্থে অন্তরের ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন,

“অন্তরের কিছু কিছু রোগ ইচ্ছা শক্তিকে প্রভাবিত করে, আবার কিছু প্রভাবিত করে ধারণা শক্তিকে।”

আত্মশুদ্ধির উপায়

আত্মশুদ্ধির যেসব উপায় সমূহ রয়েছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

সর্বদা আল্লাহকে ভয় করা : আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান।তিনি সবকিছু দেখেন ও জানেন, পৃথিবীর যেখানে যা কিছু হচ্ছে কোনকিছুই তাঁর জানার বাহিরে যেখানে যা কিছু হচ্ছে কোন কিছুই তা তাঁর অজানা নয়।তাই নাফস আমাদেরকে খারাপ দিকে পরিচালিত করতে চাইলে,আমাদের তাকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে,আল্লাহ বান্দার সাথে সবসময় থাকেন, তাই যেকোন খারাপ কাজ করতে লজ্জা পাওয়া উচিত। যেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য, সেই আল্লাহর সামনেই আমরা কিভাবে তাঁরই নিষেদ করা পাপ কাজের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। আমরা যদি সব সময় আল্লাহর ভয়ে অন্তরে ধারণ করতে পারি তাহলে নফস আমাদেরকে থেকে কখনো খারাপ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারবে না,ইন শা'আল্লাহ। তাছাড়া নফসের গোলামী থেকে বেঁচে থাকার জন্য কোরআন ও হাদীস শরীফে বারবার তাগাদা দেওয়া হয়েছে।

কোরআনে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَاَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَ نَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰىۙ

فَاِنَّ الۡجَنَّةَ هِىَ الۡمَاۡوٰىؕ

অর্থ - "পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হাওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল খুশি (মতো চলা) থেকে নিজেকে নিবৃত রেখেছে তার ঠিকানা হবে জান্নাত"।

(সূরা নাযি'আত : ৪০)

যাবতীয় পাপ কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবগত থাকা : এই দুনিয়াতে বান্দা যত ক্ষুদ্র পাপ কাজই করুক না কেন তার শাস্তি অবধারিত।কোনো ভাবেই বান্দা প্রাপ্য শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। কিয়ামতের দিন ধনী গরিব নির্বিশেষে সবার শাস্তি পেতে হবে।এ সম্পর্কে দুইটি হাদিস নিচে দেওয়া হল :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম একদিন বললেন,তোমরা কি জানো নিঃস্ব কে? সবাই বলল,আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি যার কোন টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তখন তিনি বললেন,আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব সেই ব্যক্তি,যে দুনিয়া থেকে সালাত,সিয়াম,যাকাত ইত্যাদি আদায় করে আসবে। সাথে ঐসব লোকেরা আসবে,যাদের কাউকে সে গালি দিয়েছে,কারো ওপর অপবাদ দিয়েছে,কারো মাল গ্রাস করেছে,কাউকে হত্যা করেছে বা কাউকে প্রহার করেছে। তখন ঐসব পাওনাদারকে ঐ ব্যক্তির নেকি থেকে পরিশোধ করা হবে। এভাবে পরিশোধ করতে করতে যদি তার নেকি শেষ হয়ে যায়,তখন ঐসব লোকদের পাপ সমূহ এই ব্যক্তির উপর চাপানো হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি বলেন, ‘কেয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক বুঝিয়ে দেওয়া হবে।’৪

২.হযরত জাবের (রাঃ) বলেন,রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, ‘আমার উপরে

(মি'রাজে বা স্বপ্নে) জাহান্নামকে হাজির করা হয়। তাতে আমি বনি ইসরাইলের

একজন মহিলাকে দেখলাম যাকে একটি বিড়ালের কারণে আজাব দেওয়া হচ্ছে।

সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল। তাকে খেতেও দেয়নি,ছেড়েও দেয়নি,যাতে সে

জমিনে বিচরণ করে পোকামাকড় ইত্যাদি খেতে পারে। অবশেষে বিড়ালটি ক্ষুধায়

মারা যায়। তাছাড়া আমি সেখানে আমর ইবনে আমের আল-খুযাঈকে দেখলাম।

সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে নিজের নাড়ি-ভুঁড়ি টেনে চলেছে। এ ব্যক্তি সর্বপ্রথম

দেব-দেবীর নামে ষাঁড় ছেড়ে দেওয়ার কুপ্রথা চালু করেছিল।'৫

প্রতিনিয়ত কবর ও জাহান্নামের কথা মনে করা : মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর কবর

আমাদের একমাত্র ঠিকানা। কিয়ামতের আগ পর্যন্ত কবরই মৃত্যুর পরের বাসস্থান।

তাই এই কবরের জিবন যেন শান্তিময় হয় সেই জন্য খারাপ কাজ থেকে দূরে

থাকার পাশাপাশি ভালো কাজকে নিজের সঙ্গী বানিয়ে নেওয়া উচিত।

নিচে এ সম্পর্কে দুটি হাদিস দেওয়া হল :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা

স্বাদসমূহ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো।'৬

২. হযরত ওসমান গণি (রাঃ) কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতেন। তাতে তাঁর দাঁড়ি ভিজে

যেত।তাঁকে বলা হলো,জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে আপনি কাঁদেন না।অথচ কবর

দেখে কাঁদেন। জবাবে তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'নিশ্চয়ই

কবর হলো আখেরাতের মঞ্জিল সমূহের প্রথম মঞ্জিল। যদি কেউ এখানে মুক্তি পায়,

তাহলে পরবর্তী গুলো তার জন্য অধিকতর সহজ হয়ে যাবে। আর যদি এখানে

মুক্তি না পায়, তাহলে এর পরের গুলি অধিকতর কঠিন হবে।'

তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি কবরের চেয়ে ভয়ংকর কোন দৃশ্য

দেখিনি।'৭

জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে ওহীর বিধান মেনে চলা : মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের

দুনিয়াবী যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমূহ দিয়েছেন,সেগুলো সঠিকভাবে পালন করার নিয়ম ও বাতলে দিয়েছেন।আমরা

এই নিয়মের বাইরে যেতে পারি না। প্রতিটি কাজে আল্লাহ ও রাসূলের দেখানো পথ

ব্যবহার করতে হবে,এতে করে আমরা দুনিয়া ও আখেরাত দুই জায়গায় সফলকাম হব

ইন শা'আল্লাহ।

ওহী সম্পর্কে কয়েকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

আল্লাহ বলেন :

وَ مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ * وَ مَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ ۚ

অর্থ - 'রাসূল তোমাদেরকে যা দেন,তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা হাশর : ৭)

আল্লাহ সুবহান ওয়া তা'আলা নবী-রাসূলগণ এর কাছে ওহী প্রেরণের মাধ্যমে ইসলামের বিধি-বিদান তাঁর বান্দাদের কাছ পৌঁছে দিয়েছেন। যেন তাঁর বান্দারা পথভ্রষ্ট না হয়।

আল্লাহ আরো বলেন :

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى

অর্থ - 'আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর 'ওহী' ব্যতীত।'

(সূরা নাজম : ৩)

আল্লাহর দেখানো পথই নবী রাসূলগণ আমাদের দেখিয়ে গেছেন,যাতে করে আমরা শয়তানের ধোঁকায় না পড়ে যাই।

আল্লাহ বলেন,

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ ۚ

অর্থ - 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল।'

(সূরা নিসা : ৮০)

আত্মশুদ্ধির প্রধান পদক্ষেপসমূহ

আত্মার রোগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর,তা দূর করে দোযখের আযাব থেকে মুক্তি লাভ করার পাশাপাশি, মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যে পদক্ষেপ গুলো কার্যকরী ভূমিকা পালন করে,তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. তাওবা : এটি আত্মশুদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখিত। তাওবাহর প্রকৃত অর্থ হলো, ঘটে যাওয়া পাপের জন্য অনুশোচনাগ্রস্ত হওয়া। সেই সাথে পরবর্তীতে অনুরুপ
পাপ না করার সংকল্প করা।

কুরআনুল কারীমে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ؕ

অর্থ - হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করো।

(সূরা আত-তাহরীম : ৮)

ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেন : মানুষকে ভেজালমুক্ত হওয়ার জন্য দুই ধরনের তাপ,যথা - দোযখের আগুনের তাপ ও অনুশোচনার তাপ হতে কোন না কোন প্রকার তাপে অবশ্যই দগ্ধ হতে হবে এখন (তার ইচ্ছা) সে যদি চায় নিজের জন্য জাহান্নামের আগুনকে অবলম্বন করতে
পারে। আর যদি এটা তার কাছে কষ্টকর মনে হয়,(যা আসলেও অনেক কষ্টকর) তাহলে তার জন্য এ দুনিয়াতেই নিজ অন্তরের অনুতাপ ও অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই। এই আফসোস অনুতাপ ও অনুশোচনার নামেই 'তাওবা'।
এজন্য হাদিস শরীফে বলা হয়েছে :

"অনুশোচনাকেই তওবা বলে"*৮

তাওবার তিনটি প্রধান মাধ্যম রয়েছে,এগুলো হলো -

ইলম,অনুশোচনা, ক্ষতিপূরণ

*** ইলম :** মানুষের মাঝে সঠিক ইলম না থাকলে কোনটা তার জন্য ভুল আর কোনটা ক্ষতিকর তা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। কেউ কোন কাজ করার পর

যতক্ষন পর্যন্ত না জানতে পারছে,কাজটি কি অবৈধ? অথবা এই কাজটির কারণে সে কি জাহান্নামে পতিত হবে? ততক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ কাজের জন্য অনুতপ্ত হবে না।তাছাড়া প্রকৃত ইলম আমাদের ক্বলবকে জীবিত রাখে এবং সঠিক পথের আলো দেখায়।

তাই সঠিক ইলম হাসিলের মাধ্যমে মানুষ গুনাহকে গুনাহ হিসেবে চিহ্নিতকরণের পাশাপাশি,

অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং গুনাহর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

اِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থ - "আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে প্রকৃত জ্ঞানীরাই তাকে ভয় করে"।

(সূরা ফাতির : ২৮)

*** অনুশোচনা :** প্রকৃত ইলম অর্জন করার পর, বান্দা যখন বুঝতে পারবে তার পূর্বে করা কাজটি মন্দ বা ক্ষতিকর ছিল, তবে অবশ্যই তাকে নিজের করা

খারাপ কাজটির জন্য দুঃখিত হতে হবে।

***ক্ষতিপূরণ :** ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে প্রথম যে কাজটি করতে হবে, তা হল ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ

থাকতে হবে যে, ভুলেও পূর্বের করা গুনাহের কাজ ভবিষ্যতে করা যাবে না।

আর দ্বিতীয় হল, গুনাহকৃত পাপের ফলে যদি কোন বান্দার হক নষ্ট হয়, তাহলে যত দ্রুত সম্ভব সে বান্দার হক আদায় করে দিতে হবে। যেমন,কারো সম্পদ জোরপূর্বক ভোগ করলে

তা ফিরিয়ে দাওয়াআর যদি গুনাহের সম্পৃক্ততা আল্লাহর হকের সাথে হয়ে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে কাজা অথবা কাফফারা দিয়ে গুনাহের ক্ষতিপূরণ করতে হবে।যেমন নামায না পড়তে পারলে বা রোজা না করতে পারলে, এগুলোর কাজা করা।

আর যদি গুনাহটি এমন গুনাহ হয়, যার ক্ষতি পূরণ কাজা বা কাফফারার মাধ্যমে সম্ভব নয়

সেক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে নরম ও অনুতপ্ততার সাথে ইস্তেগফার করতে হবে। হযরত থানভী (রহঃ) এর ভাষায়, একটি লোক সামান্য সময়ের মধ্যেই আল্লাহ পাকের কামেল ওলি হতে পারে। কারণ হাদীস শরীফে মহানবী (সাঃ) বলেন,

"গুনাহ থেকে তওবাকারী ঐ ব্যক্তির মত, যে কোনো গুনাহ করেনি"। ৯

যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষের মৃত্যুর লক্ষণ শুরু হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সবার জন্য তাওবার দরজা

খোলা থাকে। কারণ যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে যায় তখন তার তওবা আর কবুল হয় না।

২. ধৈর্য : ধৈর্য এর আরবি প্রতিশব্দ সবর (صبر)। যার অর্থ সংযম। মুমিন ব্যক্তির একটি অত্যাবশ্যকীয় গুণ যার দ্বারা সে নিজের নাফসকে অবৈধ বা নিষিদ্ধ খেয়াল খুশি

থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়। ইসলামী পরিভাষায় সবর শব্দটির অর্থ অনেক বিস্তৃত। শুধু

নিজের কষ্টের সময় হতাশ না হওয়াটাই ধৈর্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। বান্দার দৈনন্দিন জীবনের সকল ক্ষেত্রে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। দিনশেষে সেই বিজয়ী যে এই সকল পরীক্ষার মাঝে ও নিজের নফসকে ভালো কাজের দিকে ধাবিত করে এবং পাপ কাজ থেকে দূরে থাকে। ধৈর্যের প্রতিদান অন্য যেকোনো নেক কাজের চেয়ে বেশি।

কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে :

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

অর্থ - "তোমরা একে অপরকে সত্য এবং ধৈর্যের উপদেশ দাও"।

(সূরা আসর : ৩)

এবং ধৈর্যের পুরস্কার নিয়ে কুরআনে বলা হয়েছে :

اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থ - " নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে"।

(সূরা যুমার : ১০)

যে ব্যক্তি ধৈর্যের মাকাম (উচ্চ) লাভ করে, তার সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন :

" ধৈর্যের চেয়ে উত্তম এবং প্রশস্ত কোন নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয়নি"।১০

৩. শোকর : মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পৃথিবীতে অগণিত নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। এসব নেয়ামতের মধ্যে এমন অনেক নেয়ামত যা বান্দা না
চাইতেই পেয়ে যায়। তাই বান্দার উচিত সর্বদা সকল নেয়ামত সমূহের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে শোকর আদায় করা,এবং নেয়ামত গুলো

শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্ট অনুযায়ী তাঁর রাস্তায় ব্যয় করা। কেবল ভালো সময়ে নয়

খারাপ বা বিপদের সময় ও বান্দাকে নেয়ামতের কথা মনে রাখতে হবে,কেননা বান্দার খারাপ সময়েও আল্লাহ না কোনো কোনো ভাবে তার প্রতি নেয়ামত দান করেন। ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'এহইয়াহ উলূমিদ দ্বীনে',মানুষ যে বিষয় গুলোতে

ধ্যান দিলে 'মাকামে শোকর' হাসিল করতে পারবে সেসম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৪. দুনিয়া বিমুখতা : দুনিয়া বিমুখতা মানে দুনিয়ার ধন সম্পদের প্রতি মানুষের মনে কোনো

লোভ ও আকর্ষণ না থাকা। এর আরবি প্রতিশব্দ হলো যুহদ (زُهد)।

এটি আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করার আরেকটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। যুহ্দের সর্বোচ্চ স্তর

ছিল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। দুনিয়ার ধন-সম্পদের প্রতি কোন আকর্ষণ

মহানবী (সাঃ) এর কখনোই ছিল না, ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই ব্যবহার করতেন। এমনকি খাবারের বেলায় ও তিনি অত্যন্ত কম খেতেন। কখনো তিনি পেট ভরে খাবার খাননি,শামায়েলে তিরমিজির কয়েকটি বর্ণনাতে এই কথা প্রমাণিত হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) ইরশাদ করেন,

"অনেক সময় আমরা মাসের পর মাস শুধু খেজুর আর পানি খেয়ে কাটিয়েছি।"১১

৫. তাওহীদ : তাওহীদ অর্থ আল্লাহকে এক ও অদ্বিতীয় হিসেবে বিশ্বাস করা এবং তার সাথে

কাউকে শরিক না করা। এটি ইসলামের মৌলিক আকীদা। আল্লাহ তাআলা

যেসব নিয়ম-কানুন,ইবাদত শরীয়তে অন্তর্ভুক্ত করেছেন ও যে উপায়ে এসব পালন করার

নির্দেশ দিয়েছেন, তা সেভাবেই পালন করতে হবে। শরীয়তমত ইবাদত করা বান্দার উপর

আল্লাহর হক। আর পরিপূর্ণ হক আদায়কারীই আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তাছাড়া তাওহীদ হৃদয়কে সব ভ্রান্তি ও শয়তানের পাপ থেকে রক্ষা করে।

তাওহীদ কে প্রধান তো তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে,যথা :

- তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ
- তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ
- তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত

- **তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ :** পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন।তার কোন অংশীদারত্ব নেই।একইসাথে তিনি সৃষ্টি করেছেন, পুরো

পৃথিবীর রাজত্ব ও তাঁর,সেই সাথে কর্তৃত্ব ও করছেন তিনি নিজেই।আর এই সবে বিশ্বাস করার নামই তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ।

এ প্রসঙ্গে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন :

هَلۡ مِنۡ خَالِقٍ غَيۡرُ اللّٰهِ يَرۡزُقُكُمۡ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الۡاَرۡضِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۖ فَاَنّٰى تُؤۡفَكُوۡنَ

অর্থ - আল্লাহ ছাড়া আর কোন স্রষ্টা আছে কি?যে,তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিজিক দিবে? তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।অতএব তোমাদের কে কোথায় ফিরানো হচ্ছে?

(সূরা ফাতির : ৩)

- **তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ :** শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নামই তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক

করা যাবে না। কোন বান্দা যদি তাওহীদুর রুবূবিয়্যাহ ও তাওহীদে আসমা ওয়াস সিফাতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে ও ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করে তবে সে কাফির ও মুশরিক হয়ে চিরদিনের জন্য জাহান্নামে পতিত হবে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

اِنَّهٗ مَنۡ يُّشۡرِكۡ بِاللّٰهِ فَقَدۡ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيۡهِ الۡجَنَّةَ وَ مَاۡوٰىهُ النَّارُ ؕ وَ مَا لِلظّٰلِمِيۡنَ مِنۡ اَنۡصَارٍ

অর্থ - " নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, আর উপর আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করেছেন এবং তার ঠিকানা আগুন। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই"।

(সূরা আল-মায়েদা : ৭২)

- **তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত :** আল্লাহর যে সমস্ত গুণবাচক নাম রয়েছে সেগুলোর উপরে বিশ্বাস আনাকে তাওহীদুল

আসমা ওয়াস সিফাত বলে। আল্লাহর এসব নাম পরিবর্তন,পরিবর্ধন সম্ভব নয়,সেই সাথে নতুন কোন নাম ও গুণাবলী সংযোজন ও করা যাবে না। কোরআন ও হাদিসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়া সাল্লাম যেভাবে আল্লাহর গুনবাচক নাম ও গুণাবলীর বর্ণনা দিয়েছেন সেভাবে ছাড়া আর কোনভাবে বর্ণনা দেওয়া যাবে না। এবং আল্লাহর এসব গুণবাচক নাম কখনোই কোন মানুষের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না।

আল্লাহ সিফাতের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন :

وَ قَالَتِ الۡيَهُوۡدُ يَدُ اللّٰهِ مَغۡلُوۡلَةٌ ؕ غُلَّتۡ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ لُعِنُوۡا بِمَا قَالُوۡا ۘ

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ

অর্থ - "আর ইয়াহুদিরা বলে,' আল্লাহর হাত বাধা' ।তাদের হাতই বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং তারা যা বলেছে,তার জন্য তারা লা'নতগ্রস্ত হয়েছে। বরং আল্লাহর দু'হাত প্রসারিত।যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান করেন।"

(সূরা আল- মায়েদা : ৬৪)

৫. তাওয়াক্কুল : তাওয়াক্কুল একটি আরবি শব্দ। ইসলামী পরিভাষায় তাওয়াক্কুল অর্থ জীবনের সকল ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার উপর পরিপূর্ণ ভাবে ভরসা

রাখা। কোনভাবেই আমাদের দুনিয়াবী কোন কিছুর উপরেই ভরসা করা উচিত নয়,বরং তাকেই ভরসা করা উচিত যিনি এই দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। তিনিই একমাত্র সত্তার অধিকারী

যাকে নিশ্চিত ভাবে ভরসা করা যায়।

দৈনন্দিন সকল কাজে দৃঢ় মনোবল বজায় রেখে,সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর

উপর পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। সেই সাথে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে

হবে।তবেই ইহকাল ও পরকালনদোজাহানেই মুক্তি মিলবে।

পবিত্র কোরআনের এরশাদ করা হয়েছে :

وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থ - "আর আল্লাহর উপরই যেন মুমিনগণ তাওয়াক্কুল করে।"

(সূরা আল-ইমরান : ১২২)

আল্লাহ আরো বলেন :

وَ مَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ

অর্থ - " আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট।"

(সূরা আত-তালাক : ৩)

আত্মিক রোগগুলো থেকে বাঁচার উপায়

শয়তান বা নফসের ফাঁদে পড়ে মানুষের অন্তরে যে সমস্ত খারাপ রোগগুলো বাসা বাধে যেমন,রাগ,হিংসা,অহংকার,রিয়া-এগুলো থেকে বাঁচতে না পারলে আত্মাকে পুরোপুরি পরিশুদ্ধ করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত রোগ গুলো আল্লাহর কাছে খুবই অপছন্দনীয়, তাই আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ করতে হলে এই সমস্ত আত্মিক রোগ গুলো থেকে নিজেদের অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

নিম্নে এগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

১.রাগ : আত্মিক রোগ গুলোর মধ্যে রাগ সবচেয়ে খারাপ এবং ভয়ংকর রোগ। রাগ উঠলে

মানুষ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েন,বুদ্ধি বিবেক ঠিক থাকে না। যার ফলে হাত এবং মুখের মাধ্যমে অনেক অশোভন আচরণ প্রকাশ পায়, সেই সাথে খুনের মতো জঘন্য পাপ ও ঘটে যায়। যার শাস্তি মানুষ দুনিয়া এবং আখিরাতে দুই জায়গায় পেতে হয়। এই রাগ ব্যক্তিগত ক্ষতির পাশাপাশি সমাজের ও অনেক ক্ষতি করে থাকে। এক্ষেত্রে এ রোগকে ধ্বংসাত্মক রোগ বলেও সম্মোধন করা যায়। তাই যখনই বান্দা বুঝতে পারবে এই ভয়াবহ রোগ দ্বারা তার অন্তর কলুষিত হচ্ছে, তখনই এ ভয়ংকর রোগ থেকে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যখনই কারো উপর রাগ আসবে তখনই নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এবং তাকে ক্ষমা করা যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বান্দা কত অন্যায় করার পরও আল্লাহ তায়ালা তার শ্রেষ্ঠত্বের গুণে কত সহজে বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। তাহলে বান্দার কি উচিত নয়? তার

সাথে যে অপরাধ করেছে তাকেও ক্ষমা করে দেওয়া।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বান্দার রাগের সময় কি কি করনীয় তা শিখিয়ে গেছেন,সেগুলো হলো -

ক্রমাগত মুখে ‘আউজুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজিম’ পড়তে থাকবে।

ওযু করার ব্যবস্থা থাকলে ওযু করবে। রাগ করা অবস্থা যদি দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বসে যেতে হবে। আর যদি বসে থাকে তাহলে শুয়ে যাবে।

আল্লাহর রাগ দমনকারীকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে বলেন:

السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ - "যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরনকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল।আর সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

(সূরা আল-ইমরান : ১৩৪)

ইমাম গাজ্জালি (রহঃ) - এর কিতাব **'তাবলিগেদ্বীন'** এ রাগ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস

বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো -

"আল্লাহ তায়ালার নিকট মুসলমানের পান করার জন্য 'সর্বাধিক উত্তম ঢোক' হইলো 'গোস্বার ঢোক'।"

২. হিংসা : হিংসা এমন একটি আত্মিক রোগ, যা ইসলামের সম্পূর্ণ হারাম। রাগ যেমন মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয় হিংসাও মানুষকে বিনাশ করে দেয়। অন্য

কারো সুখ-শান্তি, ধন সম্পদ দেখে হিংসা করা মানে ওই ব্যক্তির উপর আল্লাহর বিচারকেই

অপছন্দ করা। আর একজন মুসলমানের কাছ থেকে এরূপ কোন ভাবে আশা করা যায় না। আর এই হিংসার কারনে বান্দার যত নেকি আছে সব ধ্বংস হয়ে যায়। সেই সাথে তার

অন্তর হিংসার অনলে পুঁড়ে ছাই হয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

" হিংসা নেকী সমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন কাঠের খণ্ডকে জ্বালিয়ে খেয়ে শেষ করে ফেলে।"১২

হযরত হাকিমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার,

'আদাবুল ফিকির'- গ্রন্থে হিংসার চিকিৎসার উপায় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকটি আমলের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো -

* যার বিরোধী হিংসা জাগে তার জন্য প্রতিদিন দেয়ার নিয়ম চালু রাখা।
* স্বীয় মজলিসগুলোতে তার প্রশংসা করা।
* মাঝে মাঝে তাকে হাদিয়া দেওয়া।
* কখনো নাস্তা বা কখনো রাতের খানার জন্য তাকে দাওয়াত করা।
* সফরে যাওয়ার সময় তার সাথে পড়ে যাওয়া সফর হতে ফিরে আসার পর হাদিয়া কোন কিছু নিয়ে আসা।

এই সমস্ত আমল গুলি তিনি কমপক্ষে দুমাস ধরে করার জন্য জোর দিয়েছেন। যদিও এ

আমলগুলো করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য সেই সাথে তিক্ততার ও । তবে কষ্ট করে আমল গুলি করার পর দেখা যাবে যার প্রতি হিংসা বা ঘৃণার উদয় হয়েছিল, তা অনেকটাই কমে যাবে এবং হিংসার বদলে অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা অনুভব হবে, পাশাপাশি মনে অনেক সুকুন মিলবে ইন শা'আল্লহ। আর ভবিষ্যতে যেন হিংসার উদ্বেগ

না হয় অন্তরে সেই জন্য বেশি বেশি দোআ করতে হবে আল্লাহর কাছে। নিজের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি যার প্রতি হিংসা আসবে তার জন্য বেশি বেশি দোয়া করতে হবে।

তবেই এই খারাপ ব্যাধি থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখা যাবে।

৩. অহংকার : কোন ব্যক্তি নিজেকে সর্বদা মহৎ ও বড় বলে জাহির করা, অন্য ব্যক্তির কথার কোন মূল্য না দেয়া,তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা- ব্যক্তির এ সকল

আচরণই অহংকারের বহিঃপ্রকাশ, যার ফলে তার নিবাস সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্থানে। ব্যক্তি যা

কিছু নেয়ামত অর্জন করে তার সমস্ত কিছুই আল্লাহর রহমতের দান,তিনি চাইলেই যে কোনো মুহূর্তেই তাঁর সেই সমস্ত নেয়ামত সমূহ বান্দা থেকে নিয়ে নিতে পারেন। তাই কোনভাবেই আল্লাহর দেয়া নেয়ামত সমূহ নিয়ে অহংকার করা উচিত নয়। অহংকারীর মন

অনেক কঠিন হয়ে যায় বলে, আল্লাহর কাছে তার কোনো ইবাদতই কবুল যোগ্য হয় না।

এ সম্পর্কে হাদিসে বলা হয়েছে,

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

"যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকবে ,সে জান্নাতে প্রবেশ করতে

পারবে না।"১৩

কোরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَ لَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَرَحًا ؕ

اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

অর্থ - "আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিও না, আর জমিনে দম্ভ করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহংকার কারীকে পছন্দ করেন না।"

(সূরা লুকমান : ১৮)

আমরা সূরা আল-বাকারা থেকে জানতে পারি যে,যেই ইবলিশ আল্লাহর এত ইবাদত করতো অথচ আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে অহংকার করার শাস্তি সে সাথে সাথেই পেয়ে গেল।

এ সম্পর্কিত আয়াতটি হল :

وَ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّاۤ اِبْلِیْسَ ؕ

اَبٰی وَ اسۡتَکۡبَرَ ۟ وَ کَانَ مِنَ الۡکٰفِرِیۡنَ

অর্থ - "আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম,'তোমরা আদমকে সেজদা করো'। তখন তারা সেজদা করলো,ইবলিশ ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহংকার করলো। আর সে হলো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।"

(সূরা আল-বাকারা : ৩৪)

অহংকার থেকে বাঁচতে হলে বান্দার উচিত-সর্বদা নিজের গুনাহ সমূহের কথা চিন্তা করা, এবং

বিচার দিনে নিজের হিসাব নিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করা। সেই সাথে অহংকারের ফলে কি ধরনের শাস্তি আল্লাহ দুজাহানে রেখেছেন, তা সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা যাতে করে অন্য ব্যক্তিকে তুচ্ছ করা বা তাকে নিয়ে অভিযোগ করার ইচ্ছা

মনে জাগ্রত হওয়ার সুযোগ না পায়।

প্রকৃত জ্ঞানী ও ঈমানদার ব্যক্তিগণ সব সময় নিজেকে ছোট ও তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাদের আচরণ সব সময় নরম থাকে। মানুষের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে তারা সর্বদা বিনয়ী থাকেন। যার দরুন মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের দৃষ্টিতে এ সকল ব্যক্তির সম্মান এবং মর্যাদা অনেক গুণ বাড়িয়ে দেন।

৪.রিয়া : লোক দেখানো ইবাদত করা বা নেক কাজ করাকে রিয়া বলে। ঈমানদার বান্দার ইবাদত ধ্বংস করার জন্য এটি শয়তানের অন্যতম একটি ভয়ংকর ফাঁদ। দুনিয়াবি

মানুষের কাছ থেকে সম্মান পাওয়ার আশায় কিংবা কোন পুরস্কারের লোভে কোনো ভালো কাজ করা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিয়ার ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন :

"কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তাদের একজন বড় আলিম,একজন প্রসিদ্ধ শহীদ ও একজন বড় দাতা। তারা আজীবন আল্লাহর

ইবাদত বন্দেগীতে কাটালেও রিয়ার কারণে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।"১৪

রিয়া মানুষের নেক আমল ধ্বংস করার পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে ও বাধা দেয়। যার দরুণ মানুষ এবাদত ও ভালো কাজ করার পরও আখিরাতে তো পুরস্কৃত হয়ই না,বরং কঠিন শাস্তি পেতে হয়।

রিয়া থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রথমেই অন্তরে এখলাস অর্জন করার পাশাপাশি শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইবাদত ও নেক কাজ করার নিয়ত করতে হবে। রাসূল (সাঃ) বলেছেন -

"নিশ্চয়ই প্রতিটি আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল,এবং মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে।"১৪

রিয়া থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দোয়া শিখিয়েছেন। দোআটি হল -

" হে আল্লাহ ! আমি জেনে-বুঝে আপনার সাথে কোন শিরক করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই, আর যা আমি, জানিনা তার জন্য ক্ষমা চাই।"১৫

প্রতিদিন এই দোয়া পাঠ করলে,ইন শা'আল্লাহ মহান আল্লাহ আমাদের অন্তরকে রিয়া মুক্ত রাখবেন। তার সাথে নফল ইবাদত গুলো গোপনে করার চেষ্টা করতে হবে (নফল নামায,রোজা, দান-সদকা ইত্যাদি)। কিন্তু রিয়ার ভয়ে ফরজ ইবাদত লুকানো যাবে না, তার যে নির্দিষ্ট সময় সেই সময় যে অবস্থাতেই থাকা হোক না কেন তা আদায় করে ফেলতে হবে।

এছাড়া রিয়ার শাস্তি সম্পর্কে বারবার স্মরণ করা এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সন্তুষ্টির আশা না করে একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির (যা চিরস্থায়ী) নিয়তে আমল করলে রিয়া থেকে পরিপূর্ণভাবে মুক্ত থাকা যাবে,ইন শা'আল্লাহ।

আত্মশুদ্ধির ব্যবহারিক পদ্ধতি

কেবলমাত্র আত্মিক রোগ গুলো থেকে বাঁচলেই হবে না আত্মাকে পরিশুদ্ধের জন্য দৈনন্দিন জীবনে ও এর চর্চার প্রয়োজন। তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মশুদ্ধিকে উন্নত করা যায় তার কয়েকটি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো :

১.নিয়ত শুদ্ধিকরণ : যখন আমাদের মূল উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন, তখন এর মাধ্যমে আমাদের প্রতিটি কাজ ইবাদতে পরিণত হবে,সেই সাথে প্রতিটি কাজেই আল্লাহর রহমত ও বরকত পাওয়া যাবে, ইন শা'আল্লাহ। তাই প্রতিদিন কাজের শুরুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কথা মাথায় রেখে নিয়ত করা।

২.আত্ম-দর্শন : প্রতিদিন নিজেকে নিয়ে নিজের সাথে আলোচনা করুন। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার পূর্বে কিছু সময় পুরো দিনের কাজকর্ম ও চিন্তা ভাবনা নিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। সারাদিনে কোন কোন ভাল কাজ করলেন আর কোনটা করলে আরো ভাল হতো অথবা কোনো পাপ কাজ করেছেন কিনা?- এ সকল বিষয়ে নিজের সঙ্গে হিসাব নিকাশ করা,এতে করে শয়তান সহজেই অন্তরকে তার ফাঁদে ফেলতে পারবে না।

৩.নিয়মিত অর্থ বুঝে কোরআন পাঠ করা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ কোরআন অর্থসহ বুঝে পড়ার তাগিদ দিয়েছেন কারণ অর্থ বুঝে না পড়লে আমরা সেই অনুযায়ী জীবনে তার ব্যবহার করতে পারব না,যেটা আল্লাহর নির্দেশের খিলাফ। তাই আল্লাহর ভালোবাসা পেতে হলে অবশ্যই আমাদের কোরআন অর্থ

বুঝে পড়ার পাশাপাশি জীবনেও তা প্রয়োগের চেষ্টা করতে হবে।

৪.সালাতে স্থিরতা ও মনোযোগিতা আনা : আল্লাহর নির্দেশে প্রতিদিন আমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি। কিন্তু এ সালাত স্থিরতার

সঙ্গে আদায়ের ব্যাপারে আমাদের আরো অনেক মনোযোগী হতে হবে। কোনভাবেই হুড়োহুড়ি করে সালাত আদায় করা যাবেনা। ধীরেসুস্থে,অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে,বিনয়ের সঙ্গে, একাগ্র চিত্তে সালাত আদায় করতে হবে। মনে রাখতে হবে,আমরা শুধু আল্লাহর নির্দেশ পালনের জন্যই সালাত আদায় করছি না বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য সালাত আদায় করছি।

৫.ইস্তেগফারের ঠোঁটের আগায় রাখা : প্রাত্যহিক জীবনে সকল কাজের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত ইস্তেগফার পাঠ করার চেষ্টা করা।

ইস্তেগফার কে জীবনের প্রতিটি কাজের সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলা,যে কাজটি যখন শুরু করবে সাথে সাথে ইস্তেগফার পড়া ও শুরু করে দিতে হবে। এতে করে এটি অভ্যাসে

পরিণত হবে, যা তার জীবনের প্রতিটি কাজকে সহজ করে দিবে এবং সেই সাথে প্রতিটি কাজ বরকতময় করে তুলবে। আল্লাহ ইস্তেগফার কারী বান্দার দোয়া খুব দ্রুত কবুল করেন

দেন এবং তার সকল পাপ মুছে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেন।।

প্রতিদিন কমপক্ষে একশতবার ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’ পড়ার চেষ্টা করা।

কোন খারাপ কাজ করে ফেললে তার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পরবর্তীতে সেই খারাপ কাজ না করার প্রতিজ্ঞা করা।

৬.দ্বীনি ইলম অর্জন করা : দ্বীনি ইলম অর্জনের মাধ্যমে আত্মার রোগ দূর করার পাশাপাশি আত্মার পরিশুদ্ধি ও লাভ করা যায়। সেই সাথে মানুষের

আচরণে ও পরিবর্তন নিয়ে আসে। ইসলামের ইতিহাস,নবীজির জীবনি, প্রষিদ্ধ হাদিস

এ সকল বিষয়ে বই পড়ার মাধ্যমে কোনটি ভুল আর কোনটি সঠিক সেই সম্পর্কে নিজে

জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি অন্য কেউ সঠিক তথ্য পারবো,ইন শা'আল্লাহ।

৭. নাফসের নিয়ন্ত্রণ করা : নাফস নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জরুরি হলো -

- কম আহার করা এবং বেশি বেশি সদকা করা।

- কম কথা বলা এবং বেশি বেশি আল্লাহর সুবহানাহু তায়ালার জিকির করা।

- কম ঘুমানো এবং বেশি বেশি ইবাদত করা।

- গুনাহ ও সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা।

- ভালো অভ্যাস তৈরিতে নিজেকে নিয়োজিত রাখা এবং সুন্নাহর উপর আমল করা।

৮.খারাপ অভ্যাস পরিবর্তনের প্রতিজ্ঞা : যত রকমের খারাপ অভ্যাস আছে (অহংকার করা,মিথ্যা বলা,রাগ করা,গীবত) আস্তে আস্তে

এগুলো পরিবর্তনের অভ্যাস করা। প্রয়োজনে দিনে একটি করে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করার

প্রতিজ্ঞা করা। পাশাপাশি ভালো গুণগুলো আয়েত্ত আনার চেষ্টা করা। সেই সাথে আল্লাহর সাহায্য চেয়ে দোয়া করা।

৯.দ্বীনি লোকের সান্নিধ্যে থাকা : চলার পথে এমন সঙ্গী রাখা যার দ্বারা কোন পাপ কাজ সংঘটিত হয় না। দ্বীনি জ্ঞান যার আছে সে নিজে যেমন

আল্লাহর পথে থাকে,তেমনি তার সঙ্গীকেও আল্লাহর পথে থাকার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়।

সে ব্যক্তি নিজে ও তার বন্ধুকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে।

১০.নজরের হিফাজত : যত রকমের অপবিত্র,অশ্লীল কাজ রয়েছে তা দেখা থেকে নিজের চোখকে হিফাজতে রাখতে হবে। বারবার নিজেকে মনে করিয়ে

দিতে হবে যে ,আল্লাহ সব দেখছেন। কোন কিছুই তার জানার বাহিরে নয়।

১১.জিহবার হেফাজত : অন্যের দোষ-ত্রুটি বলে বেড়ানো, সমালোচনা করা বিশেষ করে যখন ব্যক্তি ওই জায়গায় অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ তার

অনুপস্থিতিতে তাকে নিয়ে গীবত করা যাবে না। ইসলামের দৃষ্টিতে গীবত করা হারাম।

প্রকৃত মুমিন ব্যক্তি হারাম থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রাখে। আর তাই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতে সকল প্রকার খারাপ কথা ও গালিগালাজ থেকে আমাদের জিহবাকে দূরে রাখতে হবে।

১২.জিকির করা : জিকিরের মাধ্যমে অন্তর নরম ও পাপ মুক্ত হয়।এটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম একটি পন্থা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জিকির হল :

* তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ)
* তাহমিদ (আলহামদুলিল্লাহ)
* তাকবির (আল্লাহু আকবার)
* তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)
* দরুদ (আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা নাবীয়্যীনা মোহাম্মদ)

সকল ভালো গুণ অর্জনের পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করে,জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। বিপদ আপদে আল্লাহকে স্মরণ করে পড়া - **" ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন....."**।

তাসাউফের সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি :

তাসাউফ সাধারনত আত্মিক উন্নয়নের পথ হলে ও এর প্রভাব সমাজ ও

সমাজের মানুষের উপরও পড়ে। এটি সমাজে ন্যায় ও মনুষ্য সেবার ভিত্তি তৈরী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তাসাউফের সামাজিক ভিত্তি :

সামাজিক মূল ৩টি ভিত্তির উপর দন্ডায়মান রয়েছে,সেগুলো হলো -

* একজনের আরেকজনের প্রতি সহানুভূতিশীলতা

* সামাজিক নীতি

* মনুষত্ব্য

এসব ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাহ নীতিগত শিক্ষা থেকে আবির্ভূত হয়েছে।

সামাজিক জীবনে তাসাউফের প্রভাব :

১. মানবীয় গুণাবলীর অভ্যাস : তাসাউফ মানুষের মানবীয় গুণগুলিকে জাগ্রত করতে কোন ভূমিকা পালন করে থাকে। যার জন্য মানুষ একে অপরের কষ্ট বুঝতে ও একে অন্যের বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তার এই ক্ষমাশীলতা ও করুণার মত গুণাবলীর কারণে সমাজে ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব কমে যায়।

২. সমাজে শান্তি- শৃঙ্খলা বজায় রাখা : যত রকমের আত্মিক রোগ আছে, তা থেকে মুক্তির মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত শান্তি লাভ করে,আর ব্যক্তি শান্তিতে থাকা মানে, সমাজে ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকা।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ : সমাজে সবাই মিলেমিশে বসবাস করতে গেলে ঐক্য গঠন করা অত্যাবশ্যক। মিলেমিশে না থাকলে সমাজের যে কোনো বিপদ আপদে বা যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই সবরকম পরিস্থিতিতে পরিবার ও সমাজে সকলে মিলেমিশে একসাথে উন্নয়নের কাজ করতে গেলে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজন অনেক বেশি।

তাসাউফের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গি

তাছাউফের নীতিগত শিক্ষা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে একজন মানুষের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে। কিছু নীতিগত আচরণ হলো -

১. নমনীয়তা : নমনীয়তা মানুষের অন্যতম একটি বিশেষ গুণ, যার দ্বারা মানুষ খুব সহজেই অন্যের ভালোবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নমনীয়তা মানুষের মনকে নরম করে অন্তরকে প্রসারিত করে। একে তাসাউফের মূল ভিত্তি বলা হয়ে থাকে।

২. বিশুদ্ধতা : এই গুণ ব্যক্তিকে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের পাশাপাশি নিজের সম্পর্কে প্রচারণা থেকে দূরে রাখে। এই গুণ অর্জনের মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবে না অন্যদের নিয়েও ফিকির করে।

৩. বিশ্বাসযোগ্যতা : এই মূল্যবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, সামাজিক বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। এটিকে ঈমানের জরুরী অংশ বলে মনে করেন তাসাউফের অনুসারীরা।

তাসাউফ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ

সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করা তাসাউফের একটি অন্যতম গুণ। যে গুণটি সুফি সাধকদের মাঝে বজায় ছিল। তারা সর্বদা অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্য করতেন। গরীব দুঃখীদের পাশে দাঁড়াতেন।

১. অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো : তাসাউফ আমাদের অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে শেখায়, বিপদে-আপদে গরিবদের সাহায্য করতে শেখায়। এর ফলে

দারিদ্র সীমার নিচে বাস কারীরা উপকৃত হয়,সেই সাথে কিছুটা হলেও সমাজ দারিদ্রতা থেকে মুক্তি পায়।

২. নীতি প্রতিষ্ঠাকরণ : আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ ন্যায় নীতি সম্পর্কে সচেতন হওয়ায়, সমাজকে অন্যায় হওয়া থেকে বাচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। যার ফলে

সমাজে কেউ কারো অধিকার নিয়ে কিংবা কারো সাথে অসম্মানজনক কোনো কাজ করতে পারে না। এতে করে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাসাউফও অন্য ধর্মের প্রতি সম্প্রীতি

অন্য ধর্মের প্রতি সম্প্রীতি ও সহানুভবতা বজায় রাখা, তাসাউফের একটি অন্যতম গুণ।

সুফি গণ নিজ ধর্ম পালনের পাশাপাশি অন্য ধর্মের প্রতিও সম্প্রীতি বজায় রাখতেন এতে করে,শান্তি বজায় রাখার মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ নির্বিশেষে সমাজে একত্রে বসবাস করছে।

আধুনিক সমাজে তাসাউফের প্রয়োজনীয়তা

১. নীতিগত বিনাশ রোধ : বর্তমান যুগে মানুষের অস্থিরতা,অল্পে ধৈর্য্যচ্যুত হওয়া, হিংসা ও অহমিকা, কথায় কথায় পরিবার ভেঙে দেওয়া,

অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা-এসকল অনৈতিক কাজের ফলে,পরিবার ও সমাজ ধ্বংসের পথে এগোচ্ছে। এসব থেকে উদ্ধারের একটাই পথ,আর তা হলো তাসাউফের নীতিগত শিক্ষা।

২.মনের স্বাস্থ্যের উন্নতি : জিকির,শোকর,ধৈর্য্য,তাওয়াক্কুল এ সমস্ত আমলের মাধ্যমে শুধুমাত্র আত্মার পরিশুদ্ধি হয় না,সেই সাথে মানসিক চাপ ও কমে যার ফলে

মানসিক শান্তি বজায় থাকে।

আত্মশুদ্ধির পথে বাধা ও এর সমাধান

আত্মশুদ্ধি অর্জন করতে গিয়ে মানুষ নানা রকম বাধা-বিপত্তিতে পড়ে, এইসব বাধা-বিপত্তির সাথে মোকাবেলা করা সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মশুদ্ধি অর্জন করা অনেক কষ্টসাধ্য বিষয় এবং সেই সাথে সামনে আসা বাধা-বিপত্তি গুলো দূর করতে অনেক বেগ পোহাতে হয়। যত বাধাই আসুক না কেন, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, এতে করে ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি, সামাজিক জীবনের ও উন্নতি ঘটবে। নিয়মিত নামাজ,জিকির ও রোজা পালনের ফলে নফসকে সংযত রাখার মাধ্যমে শয়তানকে প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির ইতিবাচক ফলাফল

তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি এমন একটি সাধনা যার ফলে অভ্যন্তরীন খারাপ আচরন সমূহ দূর হওয়ার পাশাপাশি বাহ্যিক উন্নতি ও ঘটে থাকে। যার কারনে ব্যাক্তি পরিবার,সমাজ সব জায়গায় সম্মান লাভ করে যে সমস্ত ইতিবাচক পরিবর্তন হয়,তা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. আত্মার শান্তি : তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে আমাদের অন্তরের সকল প্রকার রোগসমূহ দূর হয়ে যাওয়ার ফলে,মনে অনেক শান্তি পাওয়া যায়। এতে করে ব্যক্তির জীবনের সকল কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। আর এই অভ্যন্তরীন শান্তির ফলে ধীরে ধীরে আত্মাও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

২. নীতিগত ও চরিত্রগত উন্নতি : মাধ্যমে যত রকমের খারাপ গুণাবলী আছে সব দূর করে, চরিত্রকে ভালো গুণগুলো ধরা পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে, আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

৩. সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের উন্নতিকরণ : সকল ধরনের খারাপ চরিত্র দূরীকরণের ফলে, সেই সাথে

ইবাদত ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়।আর এই অর্জনের ফলে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়।

৪. সামাজিক সম্পর্কের উন্নতি সাধন : সমাজে ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা অনেক অংশে বেড়ে যায় তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধি চর্চার কারণে।

পরিবারের সমাজে সকল ক্ষেত্রে সবার মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বজায় থাকে।

৫. ব্যক্তিগত উন্নতি : নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখার কারণে, ব্যক্তি তার রাগ হতাশা দুঃখ বা খারাপ চিন্তা ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারে।

প্রাত্যহিক ইবাদত ও নীতিগত আচরণের ফলে সকলের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে।

৬. সন্তানের তারবিয়াতের উন্নতি : আত্মশুদ্ধির চর্চার ফলে মানুষ ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জানতে পারে। সে আরো বেশি জানার আকাঙ্খায় প্রকৃত ইলম অর্জন করার চেষ্টায় থাকে। যা তাকে তার নিজের দ্বীনি পরিবর্তনের পাশাপাশি নিজের সন্তানকে ও ইসলামের সঠিক জ্ঞান দান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । আর এতে করে সে আল্লাহর দেখানো পথে সন্তানের তারবিয়াত করতে সক্ষম হয়। যার পুরুষ্কার সে দুনিয়াতে ও ভোগ করবে এবং আল্লাহ চাইলে পরকালে ও শান্তি ভোগ করবে ইন শা'আল্লাহ।

৭. জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে ধ্যান দেয়া : দুনিয়াতে আমরা শুধু খাব,ঘুরবো,ফিরবো বলে

আসিনি। প্রতিটি মানুষকেই আল্লাহ কোনো না

কোনো উদ্দ্যেশে পাঠিয়েছেন,যা মানুষ আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে উপলব্দি করতে পারে।

আর এই উপলব্দিই মানুষকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে সফল হয়।

৮. আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি : তাসাউফ ও আত্মশুদ্ধির মূল উদ্দ্যেশই আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য অর্জন করা,এতে করে ব্যাক্তি দুনিয়াতে সফলতা

অর্জনের সাথে সাথে আখিরাতে ও মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

Reference :

১. ইমাম জুনাইদ,কিতাবুল মাকামাত।

২. মুসলিম : ১৫৯।

৩. ইমাম তাইমিয়্যাহ Ilm Al-Suluk (হৃদয়ের রোগ ও চিকিৎসা)।

৪. মুসলিম হা/৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭-২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ।

৫. মুসলিম হা/৯০১; মিশকাত হা/৫৩৪১'রিকবাক্ব অধ্যায়'।

৬. বুখারী, মুসলিম।

৭. তিরমিযী হা/২৩০৮; মিশকাত হা/১৩২ 'কবরের আযাব'

অনুচ্ছেদ।

৮. আল গাজ্জালী,এহইয়াউ উলুমিদ্দীন।

৯. ইবনে মাজাহ শরীফ (৩১৩)।

১০. সহীহ বুখারী ১:১৯৮,তিরমিযী ২:২২।

১১. বুখারী শরীফ ২:৯৫৫; মুসলিম শরীফ ২:৪১০।

১২. সুনানে আবু দাউদ,হাদিস নং : ৪৯০৩।

১৩. সহীহ মুসলিম,হাদিস নং : ৯১।

১৪. সুনানে তিরমিযী,হাদিস নং : ২৩৮২।

১৫. আল-আদাবুল মুফরাদ,হা/৭১৬ 'দু'আর ফযীলত' অনুচ্ছেদ,সনদ সহীহ।